শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় বসু বলরামে-মন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র ও হাজরা মহাশয়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের দ্বিতলের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন। ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র, মাস্টার, ভবনাথ, পূর্ণ, পল্টু, ছোট নরেন, গিরিশ, রামবাবু, দ্বিজ, বিনোদ ইত্যাদি অনেক ভক্ত চতুর্দিকে বসিয়া আছেন।

আজ শনিবার (২৭শে বৈশাখ, ১২৯২) -- বেলা ৩টা -- বৈশাখ কৃষ্ণাদশমী, ৯ই মে, ১৮৮৫।

বলরাম বাড়িতে নাই, শরীর অসুস্থ থাকাতে, মুঙ্গেরে জলবায়ু পরিবর্তন করিতে গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা (এযন স্বর্গগতা) ঠাকুর ও ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। ঠাকুর খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন।

ঠাকুর মাস্টারকে বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি বল, আমি কি উদার?" ভবনাথ সহাস্যে বলিতেছেন, "উনি আর কি বলবেন, চুপ করে থাকবেন!"

একজন হিন্দুস্থানী ভিখারী গান গাইতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা দুই-একটি গান শুনিলেন। গান নরেন্দ্রের ভাল লাগিয়াছে। তিনি গায়ককে বলিলেন, 'আবার গাও।'

শ্রীরামকৃষ্ণ -- থাক্ থাক্, আর কাজ নাই, পয়সা কোথায়? (নরেন্দ্রের প্রতি) তুই তো বললি!

ভক্ত (সহাস্যে) -- মহাশয়, আপনাকে আমীর ঠাওরেছে; আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া আছেন -- (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া) -- ব্যারাম হয়েছে, ভাবতে পারে।

হাজরার অহংকারের কথা পড়িল। কোনও কারণে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী ত্যাগ করিয়া হাজরার চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

নরেন্দ্র -- হাজরা এখন মানছে, তার অহংকার হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ও-কথা বিশ্বাস করো না। দক্ষিণেশ্বরে আবার আসবার জন্য ওরূপ কথা বলছে। (ভক্তদিগকে) নরেন্দ্র কেবল বলে, 'হাজরা খুব লোক।'

নরেন্দ্র -- এখনও বলি।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- কেন? এত সব শুনলি।

নরেন্দ্র -- দোষ একটু, -- কিন্তু গুণ অনেকটা।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- নিষ্ঠা আছে বটে।

“সে আমায় বলে, এখন তোমার আমাকে ভাল লাগছে না, -- কিন্তু পরে আমাকে তোমায় খুঁজতে হবে। শ্রীরামপুর থেকে একটি গোঁসাই এসেছিল, অদ্বৈত বংশ। ইচ্ছা, ওখানে একরাত্রি দুরাত্রি থাকে। আমি যত্ন করে তাকে থাকতে বললুম। হাজরা বলে কি, ‘খাজাঞ্চীর কাছে ওকে পাঠাও’। এ-কথার মানে এই যে, দুধটুধ পাছে চায়, তাহলে হাজরার ভাগ থেকে কিছু দিতে হয়। আমি বললুম, -- তবে রে শালা! গোঁসাই বলে আমি ওর কাছে সাষ্টাঙ্গ হই, আর তুই সংসারে থেকে কামিনী-কাঞ্চন লয়ে নানা কাণ্ড করে -- এখন একটু জপ করে এত অহংকার হয়েছে! লজ্জা করে না!

“সত্ত্বগুণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়; রজঃ, তমোগুণে ঈশ্বর থেকে তফাত করে। সত্ত্বগুণকে সাদা রঙের সঙ্গে উপমা দিয়েছে, রজোগুণকে লাল রঙের সঙ্গে, আর তমোগুণকে কালো রঙের সঙ্গে। আমি একদিন হাজরাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বল কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে। সে বললে, ‘নরেন্দ্রের ষোল আনা; আর আমার একটাকা দুইআনা।’ জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কত হয়েছে? তা বললে, তোমার এখনও লালচে মারছে, -- তোমার বার আনা। (সকলের হাস্য)

“দক্ষিণেশ্বরে বসে হাজরা জপ করত। আবার ওরই ভিতর থেকে দালালির চেষ্টা করত! বাড়িতে কয় হাজার টাকা দেনা আছে -- সেই দেনা শুধতে হবে। রাঁধুনী বামুনদের কথায় বলেছিল, ও-সব লোকের সঙ্গে আমরা কি কথা কই!”

[*কামনা ঈশ্বরলাভের বিঘ্ন -- ঈশ্বর বালকস্বভাব*]

“কি জানো, একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্মের সূক্ষ্ম গতি! ছুঁচে সুতা পরাচ্ছ -- কিন্তু সুতার ভিতর একটু আঁস থাকলে ছুঁচে ভিতর প্রবেশ করবে না।

“ত্রিশ বছরর মালা জপে, তবু কেন কিছু হয় না? ডাকুর ঘা হলে ঘুঁটের ভাবরা দিতে হয় না। না হলে শুধু ঔষধে আরাম হয় না।

“কামনা থাকতে, যত সাধনা কর না কেন, সিদ্ধিলাভ হয় না। তবে একটি কথা আছে -- ঈশ্বরের কৃপা হলে, ঈশ্বরের দয়া হলে একক্ষণে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, হঠাৎ কেউ যদি প্রদীপ আনে, তাহলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়!

“গরিবের ছেলে বড় মানুষের চোখে পড়ে গেছে। তার মেয়ের সঙ্গে তাকে বিয়ে দিলে। অমনি গাড়িঘোড়া, দাসদাসী, পোসাক, আসবাব, বাড়ি সব হয়ে গেল!”

একজন ভক্ত -- মহাশয়, কৃপা কিরূপে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ঈশ্বর বালকস্বভাব। যেমন কোন ছেলে কোঁচড়ে রত্ন লয়ে বসে আছে! কত লোক রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। অনেকে তার কাছে রত্ন চাচ্ছে। কিন্তু সে কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে বলে, না আমি দেব না। আবার হয়ত যে চায়নি, চলে যাচ্ছে, পেছনে পেছনে দৌড়ে গিয়ে সেধে তাকে দিয়ে ফেলে!

[*ত্যাগ -- তবে ঈশ্বরলাভ -- পূর্বকথা -- সেজোবাবুর ভাব*]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ত্যাগ না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"আমার কথা লবে কে? আমি সঙ্গী খুঁজছি, -- আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখলে মনে হয়, এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। আবার দেখি, সে আর-একরকম হয়ে যায়!

"একটা ভূত সঙ্গী খুঁছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাত-মৃত্যু হলে ভূত হয়। ভূতটা, যেই দেখে কেউ শনি মঙ্গলবারে ওইরকম করে মরছে, অমনি দৌড়ে যায়। মনে করে, এইবার বুঝি আমার সঙ্গী হল। কিন্তু কাছেও যাওয়া, আর সে লোকটা দাঁড়িয়ে উঠেছে। হয়তো ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়েছে, আবার বেঁচে উঠেছে।

"সেজোবাবুর ভাব হল। সর্বদাই মাতালের মতো থাকে -- কোনও কাজ করতে পারে না। তখন সবাই বলে, এরকম হলে বিষয় দেখবে কে? ছোট ভট্‌চার্জি নিশ্চয় কোনও তুক্‌ করেছে।"

[*নরেন্দ্রের বেহুঁশ হওয়া -- গুরুশিষ্যের দুটি গল্প*]

"নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসে, ওর বুকে হাত দিতে বেহুঁশ হয়ে গেল। তারপর চৈতন্য হলে কেঁদে বলতে লাগল, ওগো আমায় এমন করলে কেন? আমার যে বাবা আছে, আমার যে মা আছে গো! 'আমার', 'আমার' করা, এটি অজ্ঞান থেকে হয়।

"গুরু শিষ্যকে বললেন, সংসার মিথ্যা; তুই আমার সঙ্গে চলে আয়। শিষ্য বললে, ঠাকুর এরা আমায় এত ভালবাসে -- আমার বাপ, আমার মা, আমার স্ত্রী -- এদের ছেড়ে কেমন করে যাব। গুরু বললেন, তুই 'আমার' 'আমার' করছিস বটে, আর বলছিস ওরা ভালবাসে, কিন্তু ও-সব ভুল। আমি তোকে একটা ফন্দি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইটি করিস, তাহলে বুঝবি সত্য ভালবাসে কি না! এই বলে একটা ঔষধের বড়ি তার হাতে দিয়ে বললেন, এইটি খাস, মড়ার মতন হয়ে যাবি! তোর জ্ঞান যাবে না, সব দেখতে শুনতে পাবি। তারপর আমি গেলে তোর ক্রমে ক্রমে পূর্বাবস্থা হবে।

"শিষ্যটি ঠিক ওইরূপ করলে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। মা, স্ত্রী, সকলে আছড়া-পিছড়ি করে কাঁদছে। এমন সময় একটি ব্রাহ্মণ এসে বললে, কি হয়েছে গা? তারা সকলে বললে, এ ছেলেটি মারা গেছে। ব্রাহ্মণ মরা মানুষের হাত দেখে বললেন, সে কি, এ তো মরে নাই। আমি একটি ঔষধ দিচ্ছি, খেলেই সব সেরে যাবে! বাড়ির সকলে তখন যেন হাতে স্বর্গ পেল। তখন ব্রাহ্মণ বললেন, তবে একটি কথা আছে। ঔষধটি আগে একজনের খেতে হবে, তারপর ওর খেতে হবে। যিনি আগে খাবেন, তাঁর কিন্তু মৃত্যু হবে। এর তো অনেক আপনার লোক আছে দেখছি, কেউ না কেউ অবশ্য খেতে পারে। মা কি স্ত্রী এঁরা খুব কাঁদছেন, এঁরা অবশ্য পারেন।

"তখন তারা সব কান্না থামিয়ে, চুপ করে রহিল। মা বললেন, তাই তো এই বৃহৎ সংসার, আমি গেলে, কে এই সব দেখবে শুনবে, এই বলে ভাবতে লাগলেন। স্ত্রী এইমাত্র এই বলে কাঁদছিল -- "দিদি গো আমার কি হল

গো!’ সে বললে, তাই তো, ওঁর যা হবার হয়ে গেছে। আমার দুটি-তিনটি নাবালক ছেলেমেয়ে -- আমি যদি যাই এদের কে দেখবে।

“শিষ্য সব দেখছিল শুনছিল। সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল; আর বললে, গুরুদেব চলুন, আপনার সঙ্গে যাই। (সকলের হাস্য)

“আর-একজন শিষ্য গুরুকে বলেছিল, আমার স্ত্রী বড় যত্ন করে, ওর জন্য গুরুদেব যেতে পারছি না। শিষ্যটি হঠযোগ করত। গুরু তাকেও একটি ফন্দি শিখিয়ে দিলেন। একদিন তার বাড়িতে খুব কান্নাকাটি পড়েছে। পাড়ার লোকেরা এসে দেখে হঠযোগী ঘরে আসনে বসে আছে -- এঁকে বেঁকে, আড়ষ্ট হয়ে। সব্বাই বুঝতে পারলে, তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী আছড়ে কাঁদছে, ‘ওগো আমাদের কি হল গো -- ওগো তুমি আমাদের কি করে গেলে গো -- ওগো দিদি গো, এমন হবে তা জানতাম না গো!’ এদিকে আত্মীয় বন্ধুরা খাট এনেছে, ওকে ঘর থেকে বার করছে।

“এখন একটি গোল হল। এঁকে বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে থাকাতে দ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে না। তখন একজন প্রতিবেশী দৌড়ে একটি কাটারি লয়ে দ্বারের চৌকাঠ কাটতে লাগল। স্ত্রী অস্থির হয়ে কাঁদছিল, সে দুমদুম শব্দ শুনে দৌড়ে এল। এসে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলে, ওগো কি হয়েছে গো! তারা বললে, ইনি বেরুচ্ছেন না, তাই চৌকাঠ কাটছি। তখন স্ত্রী বললে, ওগো, অমন কর্ম করো না গো। -- আমি এখন রাঁড় বেওয়া হলুম। আমার আর দেখবার লোক কেউ নাই, কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে! এ দোয়ার গেলে আর তো হবে না। ওগো, ওঁর যা হবার তা তো হয়ে গেছে -- হাত-পা ওঁর কেটে দাও! তখন হঠযোগী দাঁড়িয়া পড়ল। তার তখন ঔষধের ঝোঁক চলে গেছে। দাঁড়িয়ে বলছে, ‘তবে রে শালী, আমার হাত-পা কাটবে।’ এই বলে বাড়ি ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। (সকলের হাস্য)

“অনেকে ঢং করে শোক করে। কাঁদতে হবে জেনে আগে নৎ খোলে আর আর গহনা খোলে; খুলে বাক্সর ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেয়। তারপর আছড়ে এসে পড়ে, আর কাঁদে, ‘ওগো দিদিগো, আমার কি হল গো’!”